



# আপনিও পারবেন

বিশ্বাস করলেই সম্ভব। যে-কারো পক্ষেই। অসম্ভব তখনই, যখন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। হে তরণ! আপনি বিশ্বাস করুন। সাফল্য আপনারই। সমস্ত সম্ভাবনা পরিণত হবে দৃশ্যমান বাস্তবতায়।

আপনার আগে যারা পেরেছেন তারা বিশ্বাস করেই পেরেছেন। বিশ্বাসই তাদের দিয়েছে শক্তি, সক্ষমতা, অদম্য সাহস আর নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাওয়ার সামর্থ্য। তাদের যাবতীয় শূন্যতা একসময় রূপ নিয়েছে পূর্ণতায়।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে প্রান্তে যিনি যত বড় কাজ করেছেন, নিজের মেধা ও সম্ভাবনার স্ফূরণ ঘটিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন কোটি মানুষের অন্তরে—আমরা দেখতে পাই এই বীজ তার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছে শৈশবে, কৈশোরে, তারুণ্যে। একটি মহান লক্ষ্যই তাকে জীবনব্যাপী চালিত করেছে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে। বাধা-বিপত্তি জয় করে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন তিনি। এমনই কিছু জীবনাদর্শ তুলে ধরা হলো এবারের বুলেটিনে।

হে তরণ! এখনই সময়। আজ থেকেই শুরু করুন। লক্ষ্যের বিপরীত কাজে বা ভাবনায় আর নয়, আপনার সমস্ত চিন্তা আর প্রতিটি পদক্ষেপ হোক লক্ষ্যের অনুকূলে। প্রতিটি উদ্যোগ হোক আপনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

শুরু করুন। আপনিও পারবেন।

## সুস্বাস্থ্য

বড় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতি, নিরলস কাজ করার সক্ষমতা। এখন তারুণ্য পেরোতেই রোগাক্রান্ত হয়ে নিজের মেধাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে না পারার কারণ ভুল খাদ্যাভ্যাস ও অসুস্থ জীবনদৃষ্টি। তাই লক্ষ্যে পৌঁছাতে তারুণদের প্রথম প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য—যার মূল চালিকাশক্তি সঠিক জীবনদৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস। তাই চকোলেট, বার্গার, পিৎজাসহ সকল ধরনের ফাস্ট ফুডকে—



চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনে সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকসকে তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে তারুণদের ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্যান্সার, কিডনি জটিলতা, বন্ধ্যাত্ব, আলস্য ও হতাশাসহ অসংখ্য রোগের জন্যে দায়ী এসব পানীয়। দীর্ঘসময় এসব পানীয় পানের অভ্যাস স্নো-পয়জনিংয়ের মতোই শেষ করে দেয় তারুণদের স্বাস্থ্য। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্যে এসব পানীয় পুরোপুরি বর্জন করুন।

চিনি বারুদের চেয়েও বিপজ্জনক!



দেহে ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধির প্রধান রসদ জোগায় চিনি। ২,৩০০ জন টিন-এজারের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রণের অন্যতম কারণ চিনিযুক্ত খাবার। চিনিজাত খাবারগুলোর কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে যত লোক মারা যাচ্ছে প্রতি বছর, সেটা যুদ্ধে মারা যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি! এ কারণে গবেষকরা বলছেন, ‘সুগার ইজ নাউ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান গান পাউডার।’ অর্থাৎ চিনি বারুদের চেয়েও বিপজ্জনক।



তাই তারুণ্য থেকেই চিনি, চিনিজাত খাবার এবং মিষ্টি পুরোপুরি বর্জন করুন। মিষ্টির বদলে খেজুর খান। ডাবের পানি, লেবু পানি, মসলা চা ও গ্রিন টি পানের অভ্যাস গড়ুন। মৌসুমি ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করলে আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন। দীর্ঘসময় কাজ করতে পারবেন। ফলে আপনার মেধা বিকশিত হবে, আপনি লক্ষ্যে পৌঁছাবেন।

# লক্ষ্যের বিপরীত কাজকে ‘না’ বলুন

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বাস করতেন পাখির মতো মানুষও একদিন আকাশে উড়বে। তাই অন্যেরা যতই হাসাহাসি করুক, তারা ছিলেন লক্ষ্যে অবিচল। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর একসময় তারা উড়োজাহাজ আবিষ্কার করলেন। বদলে গেল সভ্যতার গতি। মানবসভ্যতার পুরো ইতিহাসই বিশ্বাসের বিজয়গাথা। আর জীর্ণতাকে ঝেড়ে, যুগে যুগে নতুন বাঁকবদলের নেতৃত্ব দিয়েছে তারুণরাই। তারুণ্য তাই আপাত অসম্ভব লক্ষ্যে বিশ্বাসকে পুঁজি করে যাত্রা শুরু সময়। সভ্যতাকে কল্যাণের পথ দেখানোর সময়। যে-কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রধান শর্ত লক্ষ্যের বিপরীত কাজগুলো বর্জন করা এবং লক্ষ্যের অনুকূলে সময় বিনিয়োগ করা।



বরগীয় জীবনী ও চিরায়ত সাহিত্যসহ ভালো বই পড়ুন। হাতের কাছে রাখুন কোয়ান্টাম প্রকাশনার বইগুলো। ধর্মবাণী পড়ুন। আপনি উজ্জীবিত থাকবেন সবসময়। এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাবেন অন্তরের গভীর থেকে।

## লক্ষ্যে অবিচল থাকতে—

নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মেডিটেশনে নিজের লক্ষ্যকে অবলোকন করুন। অটোসাজেশন চর্চা করুন। আপনি ভেতর থেকে ইতিবাচক হয়ে উঠবেন। নিজের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস লক্ষ্য অর্জনে আপনাকে সৃজনশীল ও কুশলী করে তুলবে। পাশাপাশি নিয়মিত ইয়োগা ও দমচর্চা করুন। এতে আপনি সুস্থ থাকবেন। থাকবেন মানসিকভাবেও সমর্থ।



## সময়কে শ্রদ্ধা করুন

তারুণ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আড্ডা দিয়ে বা ভিডিও গেম খেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তথাকথিত বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো সাময়িক আনন্দের হলেও বড় অর্জনের জন্যে এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সময়খাদক এ মিডিয়াগুলো বর্জন করে সময় বিনিয়োগ করুন প্রযুক্তি-জ্ঞান অর্জনে, নিজেকে দক্ষ করার কাজে। পড়াশোনা বা কাজের প্রয়োজনে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাউন্ট খুলতে বাধ্য হলে, জরুরি কাজটি শেষে সাথে সাথে বেরিয়ে আসুন।



## ক্ষতিকর সঙ্গ ত্যাগ করুন

যার সাথে চেতনার মিল রয়েছে, তার সাথেই গড়ে ওঠে প্রকৃত বন্ধুত্ব। গালগল্প, আড্ডাবাজি আর ক্ষতিকর নেশায় (ফেসবুকিং, গেমিং, ধূমপান, মাদকগ্রহণ ইত্যাদি) যে প্রলুব্ধ করে, সে আসলে বন্ধুরূপী শয়তান। তাই বন্ধু নির্বাচনে সচেতন হোন। আর কোনোভাবে অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে গেলে সচেতনভাবে তা থেকে বেরিয়ে আসুন।

## নেতিবাচকতাকে বিদায় করুন ঝেঁটিয়ে

আপনার লক্ষ্য যা-ই হোক, অটল-অবিচল বিশ্বাস থাকলে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে আপনি পৌঁছবেনই। তাই নিজের সম্পর্কে যে-কোনো হীনম্মন্যতা, ভয় ইত্যাদি নেতিবাচক প্রত্যয় আর বিশ্বাস দিয়ে দূর করুন। আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে মধ্যবর্তী ধাপগুলোকে গুরুত্বের সাথে নিন। কোনো ধাপে আপাত ব্যর্থতা এলে থেমে যাবেন না, লক্ষ্য অর্জনে বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ করুন।



# একজন বিজ্ঞানী কখনো অর্থের পেছনে ছুটতে পারেন না

—জগদীশচন্দ্র বসু



জন্ম : ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮  
মৃত্যু : ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ময়মনসিংহে। ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ও মা বামাসুন্দরী বসু শৈশবেই তাকে দিয়েছিলেন উদারনৈতিক শিক্ষা। আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সম্ভানকে তারা ইংরেজি মাধ্যমে না পড়িয়ে বাংলা মাধ্যমে পড়িয়েছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—

নিজের ভাষা শেখো, স্বদেশের সংস্কার ও  
ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হও।  
হৃদয়ঙ্গম করো, তুমি ওদেরই একজন।  
বিচ্ছিন্ন নও, শ্রেষ্ঠ নও।

তাই-তো কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। অধ্যাপনা শুরু করেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। তখন ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কলেজের গবেষণাগারে তার প্রবেশের অনুমতি নেই। কারণ তিনি বাঙালি। গবেষণার জন্যে পেলেন কলেজের শৌচাগারের পাশে পরিত্যক্ত ২৪ বর্গফুটের ছোট্ট একটি ঘর।

শুধু তা-ই নয়, ব্রিটিশ শিক্ষকদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম বেতন দেয়া হলো তাকে। তিনি বলেছিলেন, ‘যেদিন ন্যায্য বেতন পাব সেদিনই নেব।’ এরপর বেতন ছাড়াই অধ্যাপনা করলেন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে। তিন বছর পর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলো তাকে পূর্ণ মর্যাদায় ব্রিটিশদের সমান বেতন দিতে। তিন বছরের বকেয়া বেতনও তারা পরিশোধ করল।

১৮৯৫ সালে তিনি পাঁচ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আদান-প্রদানের তারবিহীন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এ জ্ঞান সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। তার আবিষ্কারগুলো তিনি পেটেন্ট করেন নি। তিনি মনে করতেন, একজন বিজ্ঞানী কখনো অর্থের পেছনে ছুটতে পারেন না। কারণ—

বিজ্ঞান বিক্রির পণ্য নয়।

এটি সাধনার বিষয়।

বিজ্ঞান প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের নয়,

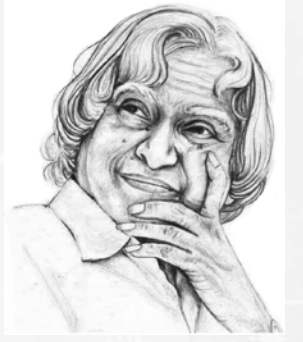
বিজ্ঞান বিশ্বজনীন।

এর পরের বছর ইতালীয় বিজ্ঞানী জি. মার্কনি তারবিহীন ২৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আদান-প্রদানের যন্ত্র তৈরি করলেন। সারা বিশ্বে খবর ছড়িয়ে পড়ল, মার্কনি হলেন বেতার আবিষ্কারক। বর্তমানে সত্যটি কিন্তু সবাই জানে। মার্কনি নন, জগদীশচন্দ্র বসুই রেডিও বিজ্ঞানের জনক। তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে রেডিও, টেলিভিশন, এমনকি রাডারেও। ওয়াইফাই প্রযুক্তির উদ্ভাবনেও তার দেয়া তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গাছের প্রাণ আছে—তিনিই প্রথম এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তুলে ধরেন। তিনি গাছ নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রায় ৩৩ বছর। বিজ্ঞানচর্চা প্রসারে ১৯১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’, যা বর্তমানে বোস ইনস্টিটিউট নামে বিশ্বখ্যাত। মানুষের কল্যাণে যিনি কাজ করেন, তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি না পেলেও ইতিহাস তাকে মাথা নুইয়ে স্বীকৃতি দেয়—তিনি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

# সমাজকে বদলাতে পারেন তিন জন মানুষ—বাবা, মা এবং শিক্ষক

—এ পি জে আবদুল কালাম



জন্ম : ১৫ অক্টোবর ১৯৩১  
মৃত্যু : ২৭ জুলাই ২০১৫

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামেশ্বরমে সাধারণ এক মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আপাত সাধারণ সেই পরিবারে ছিল অসাধারণ জীবনবোধের প্রবাহ। অর্থের দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু পিতার মননের প্রাচুর্য ছোটবেলাতেই তার মনে গেঁথে দিয়েছিল বড় মানুষ হওয়ার, ভালো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। পরিবারের কাছ থেকে নৈতিক শক্তি ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন আবদুল কালাম। এজন্যেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—

দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং

মানুষগুলোকে সুন্দর মনের করে

গড়ে তুলতে পারেন সমাজের

তিন জন মানুষ—বাবা, মা এবং শিক্ষক।

আধুনিক মানুষের মধ্যে নৈতিক শক্তির জাগরণের লক্ষ্যেই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সবার প্রতি তার আস্থা ছিল, তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করেছিলেন ব্যক্তিগত কিছু জিনিস ও বইপত্রসহ দুটো সুটকেস নিয়ে। যেদিন রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে এলেন, সেদিনও তার সাথে সুটকেস মাত্র দুটোই। দায়িত্বে থাকাকালীন যত উপহার-উপঢৌকন তিনি পেয়েছেন, সব রেখে এলেন অবলীলায়। তার বক্তব্য ছিল, এর কিছুই তো ব্যক্তি কালামের নয়। সবই দেয়া হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মানে। তাই এসব উপহার রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানেই থাকা উচিত।

২০০৭ সালে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পূর্ণ করার পর তিনি সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছেন শিশু-কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে। মহৎ লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে নিরন্তর স্বপ্ন দেখিয়েছেন নতুন প্রজন্মকে। লিখেছেন উইংস অব ফায়ার, ইগনাইটেড মাইন্ডস, ইনডমিটেবল স্পিরিট, ইউ আর বর্ন টু ব্লোসম, মাই জার্নি, টার্নিং পয়েন্টস-এর মতো বই, যা বিশ্বাস ও আশার একেকটি ফল্গুধারা।

তিনি ছিলেন কর্মে বিশ্বাসী একজন মানুষ। কাজই ছিল তার আনন্দ। তার অনুরোধ ছিল—

আমার মৃত্যুতে ছুটি ঘোষণা করো না।

আমাকে যদি ভালবাসো,

একদিন বরং অতিরিক্ত কাজ করো।

ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট বিজ্ঞানের প্রসারে তার অবদান অতুলনীয়। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন একজন বরোণ্য বিজ্ঞানী, তেমনি ছিলেন কল্যাণচিন্তা ও নৈতিকতায় অনুপ্রাণিত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সত্যিকারের ধ্যানী, জ্ঞানী ও কর্মী।

‘কালাম’ শব্দের অর্থ হলো বাণী। তার পুরো জীবনটাই একটা বাণী। এ বাণী জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার। তার কথা ও কাজ দিয়ে উত্তর প্রজন্মের কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন এক অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে।



## আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে হয় কাজের মধ্য দিয়ে

জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮  
মৃত্যু : ৮ জুলাই ২০১৬

—বাবা ইদি

প্রকৃত নাম আবদুস সাত্তার ইদি। তার জন্ম ব্রিটিশ ভারতের গুজরাটে। ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়ার সময় প্রতিদিন তার মা তাকে দুটো পয়সা দিতেন। আর বলতেন—একটি পয়সা তোমার নিজের জন্যে, আরেকটি পয়সা দেবে অভুক্ত কোনো মানুষকে।

১৯ বছর বয়সে তিনি মা-কে হারান। তার মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে আট বছর রোগযন্ত্রণা ভোগ করেন। মায়ের মৃত্যু তাকে ভীষণ আলোড়িত করে। তিনি অনুভব করেন অসহায় মানুষের জন্যে কিছু করার তাগিদ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানে যান। কয়েক বছর পর আর্ডের সেবায় বিনামূল্যের ডিসপেনসারি চালু করেন। দোকানে কাজ করে যা আয় হতো, তার বড় অংশই ব্যয় করতেন বধিহতের কল্যাণে।

সহধর্মিণী বিলকিস ইদি ছিলেন তার সুযোগ্য সহযোদ্ধা। একবার ১২ বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে তার পরিবার এলো ইদির ডিসপেনসারিতে। মেয়েটি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছে। ইদি ও তার স্ত্রী মেয়েটিকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটলেন। সারারাত কাটল তার শুশ্রুষায়। সেই দিনটি ছিল বাবা ইদি ও বিলকিস ইদির বিয়ের প্রথমদিন।

১৯৫৭ সালে তাদের দাতব্য কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হয়। সেই সময় পাকিস্তানসহ বিশ্বের নানা দেশে এশিয়ান ফু মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। দানের অর্থ সংগ্রহ করে আবদুস সাত্তার ইদি একই বছর একটি অ্যাম্বুলেন্স কেনেন। সে-ই শুরু। বর্তমানে এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দাতব্য অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক। এ সার্ভিসে রয়েছে ১৮ শতাধিক অ্যাম্বুলেন্স।

অত্যন্ত সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন তিনি। নিজের পরিচয় দিতেন—

আমি একজন মানবতাবাদী এবং  
পৃথিবীর সব ধর্মের ভিত্তি এটাই।

তার প্রতিষ্ঠিত ইদি ফাউন্ডেশন পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ কল্যাণমূলক সংগঠন, যা পরিচালিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের দানের অর্থে। ৮,৫০০টি এতিম শিশুর পুনর্বাসন ও শিক্ষার জন্যে সারাদেশে রয়েছে ১৮টি আশ্রয়কেন্দ্র। ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৫৮,২৬১টি বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেছে পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদা ও মমতায়।

তারা ৪০ হাজারের বেশি নার্সকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সারাদেশে তাদের ৩৩০টি সেবাকেন্দ্রের সামনে দোলনা রাখা আছে। এখানে নাম-পরিচয়হীন শিশুদের যে-কেউ রেখে যেতে পারে। এমনই ২৩,৩২০টি শিশুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে তারা। বিভিন্ন দুর্ঘোণে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে।

বাবা ইদি বিশ্বাস করতেন—

ধর্ম মানবিকতার বিকাশ ঘটায়।  
শুধু নিষ্ফল কথা আর প্রশংসার ফুলঝুরি  
কখনো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে না;  
তাঁর প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে হয়  
কাজের মধ্য দিয়ে।

এই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ছিল তার সমগ্র জীবন।



## ক্ষুদ্র কাজগুলোও আমরা করতে পারি প্রগাঢ় মমতা নিয়ে

জন্ম : ২৬ আগস্ট ১৯১০  
মৃত্যু : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

—মাদার তেরেসা

যুগোস্লাভিয়ায় এক আলবেনীয় পরিবারে তার জন্ম। পিতৃপ্রদত্ত নাম অ্যাগনেস গঞ্জা বোজাঝিউ। চার বছর বয়সে তার চিরচেনা জীবন প্রচণ্ড ধাক্কা খেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামায়। তিন বছরের মধ্যে বাবা মারা গেলেন। তিন সন্তানকে লালন করতে শুরু হলো তার মায়ের কঠিন সংগ্রাম।

পরিবারে ধর্মীয় চেতনা, সংবেদনশীল মন, যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের নির্মমতা তাকে বস্তুবাদী জীবন থেকে বহুদূরে টেনে নিয়ে যায় শৈশবেই। ১২ বছর বয়সে মনস্থির করলেন মানুষের সেবায় কাজ করবেন। ১৮ বছর বয়সে স্কুল জীবন শেষ করে তিনি যোগ দিলেন সিস্টার্স অব লোরেটোতে।

১৯২৯ সালে তিনি ভারতে পাড়ি জমান। কলকাতার সেন্ট মেরী'স স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। স্কুলের বাইরেই নোংরা এক বস্তিতে অগণিত অভুক্ত, পীড়িত মানুষকে দেখে তিনি ভাবতেন—সাংসারিক জীবন ছেড়ে আসাটাই সব নয়। তাকে মানবিক অবহেলার প্রতিকারে আরো কাজ করতে হবে। ছাত্রীদের টিফিনের টাকা থেকে সপ্তাহে একদিন বাঁচানো পয়সা দিয়ে খাবার ও ওষুধ কিনে সেবা দিতে শুরু করলেন সেই বস্তিতে।

১৯৪৮ সালে কনভেন্টের সাজানো-গোছানো জীবন থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নার্সের ট্রেনিং নেন। ১৯৫০ সালে কলকাতায় গড়ে তোলেন 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি'। দুহুদের মাঝে চিকিৎসা ও শিক্ষা বিস্তারে কাজ শুরু করলেন। ১৯৫২ সালে 'হোম ফর দ্য ডাইং' নামে আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলেন, পরবর্তীকালে যার নাম দেন 'নির্মল হৃদয়'। কেন স্বজনহীন মৃত্যুপথযাত্রীদের জন্যে এত কিছু করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

আমি হয়তো মূর্খকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে  
পারব না। কিন্তু সেই অন্তিম সময়ে এটুকু বোঝাতে  
পারব যে, তখনো কেউ তার জন্যে ভাবে।

কুষ্ঠরোগীদের জন্যে সেবাকেন্দ্র খোলেন যার নাম দেয়া হয় 'শান্তিনগর'। অসহায় ও নাম-পরিচয়হীন শিশুদের লালনপালনের জন্যে ১৯৫৫ সালে 'নির্মল শিশু ভবন' স্থাপন করেন। সেবাকাজে মানুষের দানের অর্থ ও সহযোগিতাকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সবসময়।

একবার যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তার ভক্তরা অর্থের জোগান বাড়াতে তাকে বিভিন্ন ধরনের বীমা ও প্রকল্পের সুযোগ নেয়ার কথা বলছিল। মাদার বললেন, তিনি ব্যক্তির দানের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতে চান, সংস্থাগত দান বা অন্যান্য অর্থ-বিনিয়োগকারী প্রকল্পের দানে নয়। তার কথা ছিল—

সবসময় ঈশ্বরই আমাকে দেখে এসেছেন।  
আজ একথা মনে করার কোনো কারণ আছে কি যে,  
সেই ঈশ্বর হঠাৎ করে দেউলিয়া হয়ে গেছেন?

তার মূলমন্ত্র ছিল—আমরা সবসময় বড় কাজ করতে না পারি, কিন্তু ক্ষুদ্র কাজগুলোও আমরা করতে পারি প্রগাঢ় মমতা নিয়ে। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বব্যাপী অসহায় মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন হাজার হাজার সেবাব্রতী। জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও মাদার তেরেসা অগণিত পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। তবে সব পুরস্কারকে যা ছাপিয়ে গেছে, তা হলো—পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ সেবার সমার্থক হয়ে আছে তার নাম।

# প্রতিভার মৃত্যু নেই, কাজের কখনো বিনাশ হয় না

—বেগম রোকেয়া



জন্ম : ৯ ডিসেম্বর ১৮৮০  
মৃত্যু : ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২

তার বাবা ছিলেন রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার। নিজে উচ্চশিক্ষিত হলেও মেয়েদের শিক্ষাদানে তার অনীহা ছিল। মেয়েরা যেন শুধু কোরআন-হাদীস পড়তে পারে, সেটুকু আরবি ও ফারসি তাদের শিখিয়েছিলেন। বড় ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের রাতে পিতার অলক্ষ্যে বোনদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষা পড়তে ও লিখতে শেখান।

কিশোরী বয়সে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অবাঙালি খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। পড়াশোনার প্রতি স্ত্রীর তীব্র আগ্রহ দেখে তার লেখালেখির প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাখাওয়াত হোসেনের ছিল নিরন্তর উৎসাহ। স্বামীর অনুপ্রেরণায় বেগম রোকেয়া ইংরেজিতেও দক্ষ হয়ে ওঠেন।

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই জ্ঞান অর্জন ফরজ—এই সত্যটি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। এ উপলব্ধি থেকেই ১৯০৯ সালে তিনি ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন স্বামীর মৃত্যুর পর। শুরুতে ছিল একটি বেঞ্চ, পাঁচ জন ছাত্রী এবং শিক্ষিকা তিনি নিজে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় একসময় ভাগলপুর ত্যাগ করতে হলো তাকে। চলে গেলেন কলকাতায়।

মাত্র ৩০ বছর বয়সে পুনরায় শুরু করলেন স্কুলের কার্যক্রম। এবারে দুটি বেঞ্চ, আট জন ছাত্রী। রোকেয়ার মোট সঞ্চয় ৩০ হাজার টাকা জমা ছিল তৎকালীন বার্মার একটি ব্যাংকে। মেয়েদের স্কুল চালু হওয়ার দুই-এক বছরে ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যায়। এমন শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি কখনো হারান নি তার দৃঢ় মনোবল।

১৯১৬ সালে গড়ে তুললেন ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’ নামে একটি মুসলিম নারী সঙ্ঘ। শিক্ষাবিধিতে নারীদের আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল এর লক্ষ্য। প্রাতিষ্ঠানিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি হস্তশিল্প ও নারীদের শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেন তিনি, যা তার দূরদর্শী চিন্তারই প্রতিফলন।

ধীরে ধীরে সমাজসেবায় মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের  
চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে,  
যেন নিন্দা গ্লানি উপেক্ষা অপমান কিছুতেই  
তাহাকে আঘাত করিতে না পারে।

প্রতিনিয়ত বাধা অতিক্রম করেই সামনে এগিয়েছেন তিনি। নীরব কাজ দিয়েই প্রতিকূলতাকে জয় করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—

প্রতিভার মৃত্যু নেই এবং  
কাজের কখনো বিনাশ হয় না।

যে কয়জন ছাত্রী তার স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, তারা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে সমাজের টীকাটিপ্পনি লোকনিন্দা জয় করে বাংলার নারী জাগরণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। কলকাতা সরকারি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, এর অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন বেগম রোকেয়ার ছাত্রী। শিক্ষিত জাতি নির্মাণে প্রাণান্ত প্রয়াসের কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ মহীয়সী নারী।

# স্বাধীনতা কি কেউ এমনি দেয়? তা অর্জন করতে হয়

—স্বামী বিবেকানন্দ



জন্ম : ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩  
মৃত্যু : ৪ জুলাই ১৯০২

যুগ সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ। তার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলকাতার এক বাঙালি পরিবারে তার জন্ম। কিশোর বয়স থেকেই তার হৃদয়ে ছিল মানুষের জন্যে সমর্মিতা। পড়াশোনা, শরীরচর্চা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতি তার আগ্রহ ছিল বেশ।

তরুণ বয়সে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ হতেন নিজের পরিচয়, বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর ভাবনা নিয়ে। খোঁজ পেলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের। স্বভাবসুলভ যুক্তিতর্ক প্রশ্ন ব্যঙ্গবিদ্রোপের বিপরীতে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছেন স্নেহময় সান্নিধ্য। একপর্যায়ে পেলেন সত্যের সন্ধান।

১৮৮৬ সাল। নরেন্দ্র তখন ২৩ বছর বয়সী তরুণ। তার ওপর দায়িত্ব দিয়ে গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পরলোকগমন করলেন। এরপর ছয় বছরের পরিব্রাজক জীবনে নরেন্দ্র অনুভব করলেন, জাতপাতের উর্ধ্বে না উঠতে পারলে মনুষ্যত্ব কখনো বিকশিত হবে না।

১৮৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ধর্মসভায় তিনি ঐতিহাসিক এক ভাষণ দিলেন। অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মাত্মতা বিনাশে জগতকে দেখালেন মানবিকতার আলো। দৃষ্ট কণ্ঠে বললেন—সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং ধর্মাত্মতা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।

১৮৯৮ সালে কলকাতায় দেখা দিল প্লেগ মহামারি। সেই দুঃসহ সময়ে মানুষের সেবায় তিনি নিজেকে নিবেদন করেন। শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেন—

মরণ ভয় তুচ্ছ করে এই সব প্লেগ রোগীদের  
সেবা আমাদের করতে হবে। এদের সেবা করতে,  
ওষুধ দিতে, চিকিৎসা করতে আমাদের বেলেড়  
মঠের জমিও যদি বিক্রি করে দিতে হয়,  
আমাদের যদি জীবন বিসর্জনও  
দিতে হয়, আমরা প্রস্তুত।

তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের জাগরণের জন্যে প্রয়োজন স্বাধীনতা। এ নিয়ে তার সাহসী উক্তি, ‘আমাদের প্রথম দরকার স্বাধীনতা। ... গোলামির শিকল ছিঁড়ে ফেল। ছিনিয়ে নে দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কি কেউ এমনি দেয় রে? তা অর্জন করতে হয়।’ এ সাহস সঞ্চারিত হয় ভারতবর্ষের লাখে তরুণের মাঝে।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সঙ্ঘ ব্যতীত কোনো বড় কাজ হয় না। এ লক্ষ্যে বিস্তৃত করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা দান, বিদ্যা দান এবং ধর্ম দানের কার্যক্রম। বিশ্বধর্মের অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিস্তারে তিনি গড়লেন বেলেড় মঠ। তরুণদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে গড়ে তোলেন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। তার আশ্রমে সন্ধ্যাবেলা হিন্দু ছাত্ররা একদিকে আরতি দিত। অন্যদিকে মুসলমান ছাত্ররা আজান দিয়ে নামাজ পড়ত।

তার বিখ্যাত উক্তি—

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

দেশপ্রেম, মানবসেবা, স্বাধীনতার মন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তার প্রকৃত লক্ষ্য। মাত্র ৩৯ বছরের জীবনকালে তার যে অনন্য অবদান, তা বিভেদহীন পৃথিবী গড়ার প্রেরণা জুগিয়ে যাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী।



## বড় কাজ করতে হলে শান্ত থাকতে হয় —ভ্যালেরি টেইলর

জন্ম : ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪

তার তখন দুই বছর বয়স। যুক্তরাজ্য থেকে তার পরিবার কয়েক বছরের জন্যে আর্জেন্টিনায় চলে যায়। বাবা ছিলেন ধর্মযাজক। আর্জেন্টিনায় অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশুদের জন্যে ভ্যালেরির মা-বাবা একটি এতিমখানা তৈরি করেন। ভ্যালেরি টেইলর মানবসেবার প্রেরণা পান মা-বাবার কাছ থেকে সেই ছোটবেলাতেই।

১৮ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাজ্যের সেন্ট টমাস হসপিটাল স্কুল অব ফিজিওথেরাপিতে ভর্তি হন। তখনই ঠিক করেন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন। ২৫ বছর বয়সে ভ্যালেরি টেইলর ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসেন ১৯৬৯ সালে, একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে। ১৫ মাস পর যুক্তরাজ্যে ফিরে গেলেও আবার এলেন ১৯৭১ সালে। সেই ক্রান্তিকালে ভ্যালেরি সিদ্ধান্ত নেন—সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে অসংখ্য যুদ্ধাহত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন।

১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব প্যারালাইজড বা পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি), যা আজ একটি আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রতিষ্ঠান।

সিআরপির শুরুটা হয় ১৯৭৯ সালে—সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিত্যক্ত সিমেণ্ট গোড়াউনে, চার জন রোগী নিয়ে। বছর কয়েক পরে হাসপাতালের প্রয়োজনে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। বেশ কয়েকবার সিআরপি-কে নানা স্থানে সরাতে হয়েছে। হাসপাতালের জিনিসপত্র, রোগী—এসব নিয়ে বার বার স্থান পরিবর্তন ছিল এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। কিন্তু ভ্যালেরি বিশ্বাস করেন, বড় কাজ করতে হলে শান্ত থাকতে হয়।

অবশেষে ১৯৯০ সালে সাভারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো সিআরপি-র কেন্দ্রীয় অফিস। বর্তমানে দেশের ১২টি জেলা শহরে এর শাখা রয়েছে। শুধু ২০২০ সালেই ৭২ হাজারের বেশি রোগীকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা দিয়েছে এ প্রতিষ্ঠান।

ঠেলাগাড়ি চালক, রিকশাচালক, রাজমিস্ত্রীদের মতো দরিদ্র মানুষদের অনেকেই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে এখানে আসে। অর্থাভাবের কারণে তাদেরকে বড় হাসপাতালগুলো ভর্তি করাতে চায় না। ভ্যালেরি অসহায় এ রোগীদের ঠাই দেন তার প্রতিষ্ঠানে। ধৈর্য, মমতা, যত্ন নিয়ে এদেরকে সুস্থ করে তোলা হয়। এরপর স্বাবলম্বী হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যবস্থা করা হয় তাদের পুনর্বাসনের।

ভ্যালেরি টেইলর বলেন,

অক্ষম, অসহায় রোগীরা যখন  
সুস্থ ও স্বাবলম্বী হয়ে বাড়ি ফিরে যান,  
তাদের এই রূপান্তর দেখাটা স্বর্গীয় আনন্দের।  
বার বার এই আনন্দের দেখা পেতেই  
আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের সেবায় তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন—

ঈশ্বর যদি আবার জন্ম দেন, তাহলে বাংলাদেশের  
মাটিতেই আমি কাজ করতে চাই।



## শুধু দীর্ঘ নয়, জীবন হোক সুখী ও তৃপ্তিময় —ডা. ডিন অরনিশ

জন্ম : ১৬ জুলাই ১৯৫৩

১৯৭২ সাল। ডিন অরনিশ তখন ১৯ বছরের তরুণ, যার জীবনে চলছে কঠিন এক দুঃসময়। প্রি-মেডিকেল কোর্সে অর্গানিক কেমিস্ট্রি বিষয়টি রপ্ত করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। একসময় ভাবলেন, তার পক্ষে এ বিষয়ে পাশ করা সম্ভব নয়। হতাশা, বিষণ্ণতা থেকে আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা দিল। পড়াশোনায় একরকম ইতি টেনে চলে গেলেন টেক্সাসে নিজের বাড়িতে।

তার মা-বাবা ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী সচ্চিদানন্দের ভক্ত ও অনুসারী। মা ও ছোট বোন স্বামীজীর কাছে যোগব্যায়াম শিখতেন। সুস্থ জীবনধারা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে একদিন গুরু সচ্চিদানন্দ অরনিশ পরিবারের অতিথি হয়ে এলেন। সেদিন স্বামীজীর সাথে ডিন অরনিশের সামান্যই কথা হলো, কিন্তু তার আশাবাদী কথাগুলো খুব উজ্জীবিত করল মানসিকভাবে অনেকটাই দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া তরুণটিকে।

ডিন অরনিশ তার কাছে শিখলেন শিথিলায়ন, মেডিটেশন, নিরামিষ খাবার, ইয়োগা, প্রাণায়াম ও মনছবির প্রক্রিয়া। তিনি জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা দিলেন অরনিশকে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন অরনিশ এবং সফলভাবে প্রি-মেডিকেল কোর্স সম্পন্ন করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। তার জীবনধারায় এলো স্থায়ী ও গভীর পরিবর্তন।

পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে হাসপাতালের কার্ডিওলজি ইউনিটে কাজের সময় হৃদরোগীদের জন্যে স্থায়ী কোনো সমাধান খোঁজার চেষ্টা করলেন। কারণ প্রচলিত চিকিৎসা অর্থাৎ এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস করা হয়েছে, এমন রোগীদের ৩০% থেকে ৫০% পরবর্তী চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে পুনঃরুকেজ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

এক দশকের বেশি সময় এ নিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করলেন তিনি। স্বামী সচ্চিদানন্দের কাছ থেকে শেখা সঠিক জীবনদৃষ্টি, মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, ও সুস্থ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করতে লাগলেন তার রোগীদের। একবছর ধরে চলল এ গবেষণা এবং এলো চমকপ্রদ সাফল্য। দেখা গেল, হৃদরোগীদের রুকেজ তো কমেছেই, সেইসাথে হৃৎপিণ্ডের চারপাশে ছোট ছোট পরিপূরক রক্তনালিগুলো সচল হয়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় ন্যাচারাল বাইপাস।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক বাঁকবদলের সূচনা করল ডা. ডিন অরনিশের এ কর্মসূচি। দিলেন নতুন ধারণা—শুধু দীর্ঘ নয়, জীবন হওয়া চাই সুখী ও তৃপ্তিময়। করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে এটি এখন আর বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি নয়; বরং চিকিৎসার মূলধারায় এর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। সফল এই গবেষণার আলোকে লিখেছেন বেস্টসেলার বই *প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ*। লাইফস্টাইল মেডিসিনের জনক বলা হয় তাকে।

তিনি বিশ্বাস করেন—

সবচেয়ে ভালো শিক্ষক তিনিই  
যার কথার প্রতিফলন রয়েছে  
তার নিজের জীবনে।

তাই তো প্রায় চার দশক ধরে সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্যে যে পরামর্শগুলো তিনি রোগীদের দিচ্ছেন, তা নিজের জীবনেও অনুসরণ করে যাচ্ছেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডা. অরনিশের দৃষ্টিভঙ্গি হলো—

মৃত্যুভয় নয়;  
বরং বাঁচার আনন্দকে  
তুলে ধরতে হবে  
রোগীর সামনে।

যা আছে তা নিয়েই শুরু করুন—এই ছোট্ট কথাটির মাঝেই লুকিয়ে আছে সকল অর্জনের মৌলিক রহস্য। এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভর করে এগিয়ে যান। সংশয়ের বিপরীতে বিজয়ের বিশ্বাস, হতাশার বিপরীতে পরিস্থিতি বদলে দেয়ার সাহস ও উদ্যম সম্বিৎ হতে দিন মনের গহীনে। যে উত্থান দেখে মানুষ বিস্মিত হয়, সেই বিস্ময় সৃষ্টির ক্ষমতা বিকশিত হবে আপনার মধ্যেও।

# যা আছে তা নিয়েই

## শুরু করুন

কানাডিয়ান প্যারালিম্পিয়ান (পক্ষাঘাতগ্রস্তদের অলিম্পিক গেমস প্যারালিম্পিকস-এ অংশগ্রহণকারী) কেভিন রেম্পেল। ২০০৬ সালে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। তার শরীরের নিম্নভাগ প্যারালাইজড বা অবশ হয়ে যায়। তার বয়স তখন ২৪ বছর।

কিন্তু আর দশ জন পক্ষাঘাতগ্রস্তের চেয়ে তিনি জীবনকে দেখলেন ভিন্ন আঙ্গিকে। বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভাবলেন নতুন ভবিষ্যতের কথা। দুর্ঘটনার পরবর্তী দুবছরে সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে। ২০০৮-এ খেলোয়াড় হিসেবে মনোনিবেশ করলেন স্লেজ-হকিতে। ২০১৩ সালে আইপিসি আইস স্লেজ-হকি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ২০১৪ সালে রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত উইন্টার প্যারালিম্পিকস-এ দক্ষতার সাথে অংশ নিয়ে দেশকে উপহার দিলেন স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদক।



রেম্পেল তার ঘুরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে বলেন ‘দ্য হিরো মাইন্ডসেট’। সাফাৎকারে তিনি জানান, ‘আপনার জীবনে যা ঘটে, সেজন্যে আপনি দায়ী না-ও হতে পারেন। কিন্তু এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আপনি কী ভাবছেন এবং কী করছেন তার জন্যে

দায়ী আপনি নিজেই। কঠিন সময়ে নিজেকে কখনো পরিস্থিতির শিকার ভাববেন না।’

নিজের জীবনের দায়িত্ব নেয়ার প্রসঙ্গে রেম্পেল আরো বলেন, ‘আপনি যদি জানেন জীবনে আপনি কোন অবস্থানে যেতে চান, তাহলেই সবকিছু বদলাতে শুরু করবে।’

তথ্যসূত্র : সাইকোলজি টুডে  
৫ আগস্ট ২০২১



১ পরনির্ভরশীল মানুষ জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। তারা জীবনকে দেখে অন্যের চোখ দিয়ে। নিজের সক্ষমতার বিচার তুলে দেয় অন্যের হাতে। ফলে তারা শুরু করতে পারে না। তাই পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসুন।

২ পরিশ্রমী হোন। কষ্টসাধ্য কাজই একজনকে আত্মবিশ্বাসী করে। এনে দেয় সাহস। অর্জনের তৃপ্তি ও আনন্দ সহজেই উজ্জীবিত করে তাকে। হ্রাস পায় রোগাক্রান্ত হওয়ার হারও। উপরন্তু সৃজনশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা বিকাশে এ অভ্যাসটি সহায়ক।

৩ অধিকাংশের ধারণা—মেধা বা প্রতিভা গড-গিফটেড। এ ধারণা ভুল প্রমাণ করলেন লেখক ডেভিড শ্যাংক। তার বই *দ্য জিনিয়াস ইন অল অফ আস*। তিনি লিখেছেন, ‘ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়; বরং অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টার ফসলই প্রতিভা।’ তাই দক্ষতা-প্রতিভা-মেধার সীমারেখা টেনে দেবেন না।

৪ প্রচলিত আরেকটি ভুল ধারণা : ভালো রেজাল্ট না থাকলে সফল হওয়া যায় না। বাস্তবতা হলো—শুধু গ্রেড নয়, যে-কোনো প্রতিষ্ঠান খোঁজে দক্ষ কর্মী। তাই নিজের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করুন। দক্ষতা অর্জনে মনোনিবেশ করুন। অভিমান, অভিযোগ ও ক্ষোভকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রতিটি কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করুন।

## কীভাবে শুরু করবেন?

নিজেকে বড় অর্জনের জন্যে তৈরি করুন। কাজকে ভালবাসুন। বড় চাকরি কিংবা ভালো পদ-পদবির জন্যে অপেক্ষার মানসিকতা পরিহার করুন। প্রথমে যে কাজেরই সুযোগ পান তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করুন। অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ফাঁকা রাখবেন না। মনে রাখবেন, ছোট ছোট কাজ ও অভিজ্ঞতার সমষ্টিই বড় কাজের ভিত্তি।

সাফল্যের নীলনকশা হলো সঠিক কর্মপরিকল্পনা। কারণ কর্মপরিকল্পনা বলে দেয় যে, প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য কতটুকু আছে এবং কতটা পরিশ্রম ও মনোযোগ দিতে হবে।

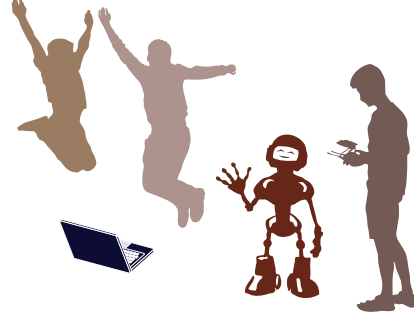
পরিশেষে, সাফল্য কেন চান—এ প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে স্পষ্ট রাখুন। প্রতিদিনের ভুলগুলো শনাক্ত করুন। দ্রুত শুধরে নিন। সময়কে সম্মান করুন।

আপাতদৃষ্টিতে সময় বা অর্থের সীমাবদ্ধতা, কারো সাহায্যের প্রতীক্ষা, শূন্য উপকরণকে অনেকেই শুরু করার অন্তরায় মনে করে। সত্য হলো, মানুষ আসলে শুরু করতে পারে না আত্মবিশ্বাসী আবেগ, ভয়, জড়তা ও ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ এ ভাবনার কারণে।

তাই সাহসী হোন। শুরু করুন।

# সৃজনশীলতা ও সমৃদ্ধির পথে

ইতিহাসের গতিপথ চিরদিনই বদলে  
দিয়েছে তারুণ্য। প্রচলিত পদক্ষেপ এড়িয়ে  
পথচলাই তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। যুগযুগান্তরে  
নতুন শ্রোত তৈরিতে তারুণ্যই দিয়েছে নেতৃত্ব।  
তাই অব্যাহত শক্তির স্ফুলিঙ্গ একেকজন তরুণ  
পরিবার-সমাজ-দেশের জন্যে হয়ে উঠবে দিনবদলের  
অনুঘটক—এটাই প্রত্যাশা।



এ প্রত্যাশার পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে অপ্রত্যাশিত সব  
মনোব্যাপি—আসক্তি, আলস্য, বিষণ্ণতা, হীনম্মন্যতা, ক্রোধ, ধ্বংসাত্মক আচরণ  
এমনকি আত্মহননের ইচ্ছা। নিজের অজান্তেই কিশোর-তরুণেরা আজ শোষকের  
হাতিয়ার। পণ্য ও প্রযুক্তির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির ফলে শুধু চারপাশ থেকে নয়, দিন  
দিন তারা নিজের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ‘কী যে চাই, কেন যে ভালো লাগে না, কী যে  
করা উচিত’—এমন হাজারো প্রশ্ন আর দ্বিধার ভিড়ে বন্দি তাদের জীবন।

প্রতিটি সমস্যায় যেমন চারপাশের সবারই কিছু না কিছু অবদান থাকে, তেমনি তা সমাধানের  
জন্মেও প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। আর সত্যিকারের সমাধানের  
জন্মে শুধু অভিযোগের আঙুল নয়—প্রয়োজন আশ্রয়, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা।

তবে সহযোগিতা শুধু অন্যেরা করবে এবং আমি জীবনটাকে বদলে ফেলব—এই ফ্যান্টাসি  
থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নিজের প্রতিও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে নিজেকেই। কারণ  
জীবন আপনার। পরিবার, বন্ধুমহল ও সমাজকে হয়তো দোষারোপ করা যাবে, কিন্তু ব্যর্থ ও  
ক্লান্তিকর বোঝার মতো জীবনটা অন্য কেউ বয়ে নেবে না।

তাই নিজেকে গড়ার দায়িত্ব নিজে নিন। বেছে নিন এমন লক্ষ্য, যা এনে দেবে সম্মান ও  
সমৃদ্ধি। নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করুন, শক্তিকে সংহত করুন। সেই শক্তি অর্থহীন যার ওপরে  
কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না—বর্তমান বিশ্বে তারুণ্যের শক্তি একথারই নামান্তর। তবে এ বাস্তবতাকে  
বদলে দিতে পারে আপনার সিদ্ধান্ত। মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়কে জানুন। গভীর বিশ্বাসে বার  
বার বলুন—আমি এক অনন্য মানুষ, আমরা এক মহান জাতি।

হে তরুণ! ধ্যানী হোন, জ্ঞানী হোন। আত্মবিশ্বাসী হোন, বিজয়ী হোন। তারুণ্যের অব্যাহত  
শক্তি প্রবাহিত হোক সৃজনশীলতা, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির পথে।



## কোয়ান্টাম বুলেটিন



কোয়ান্টাম প্রকাশনা  
ট্রি ডাউনলোড

নভেম্বর ২০২১ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক  
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা  
Phone : 222221441, 222225756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd